বর্ষ ৪ সংখ্যা ৪ নভেম্বর ২০১৭

প্রান্তজন

ইউরোপীয় ইউনিয়ন-এর মানবাধিকার ও গণতন্ত্র সনদ (ইআইডিএইচআর)-এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের আওতায় সেড প্রকাশিত বার্ষিক নিউজলেটার

সূচি

আমাদের প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে পেছনে ফেলে নয়

প্রকল্প

বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণা ও অনুসন্ধান পদ্ধতি নিয়ে কর্মশালা

চাহিদা নিরূপণ ও পরামর্শসভা

“বাংলাদেশে প্রান্তিকতার চ্যালেঞ্জ বিষয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্টিং” শীর্ষক আবাসিক কর্মশালা

কায়পুত্র, জলদাস ও চা জনগোষ্ঠী নিয়ে গবেষণা

নোটিশ বোর্ড

গ্রন্থ পর্যালোচনা

(ক) লোয়ার ডেপ্থস্: লিটিল-নোন এথনিক কমিউনিটিস অব বাংলাদেশ

(খ) স্লেভস ইন দিজ টাইমস: টি কমিউনিটিস অব বাংলাদেশ

বাগদা ফার্ম হত্যাকাণ্ড: রাষ্ট্র বনাম আদিবাসী

সম্পাদক
ফিলিপ গাইন

সম্পাদনা সহকারী
রওনক জাহান, কাজী মনজিলা সুলতানা, সাবরিনা মিতি গাইন ও সৈয়দা আমিরুন নূজহাত

পৃষ্ঠাসজ্জা সহকারী
বর্ষা চিরান ও প্রসাদ সরকার

উপদেষ্টা
ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, মোয়াজ্জেম হোসেন, জয়ন্ত অধিকারী, সিলভেস্টার হালদার এবং ভূপেশ রায়

এ নিউজলেটার প্রকাশিত হয়েছে “বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞায়ন, তাদের বর্তমান অবস্থার চিত্রায়ণ এবং তাদের সক্ষমতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি” প্রকল্পের আওতায়।

প্রকাশক
সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
১/১ পল্লবী (৫ম তলা), মিরপুর, ঢাকা-১২১৬,
ফোন:+৮৮০-২-৯০২৬৬৩৬
ই-মেইল: sehd@sehd.org, www.sehd.org

আমাদের প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে পেছনে ফেলে নয়

— জাতীয় কর্মশালায় বক্তারা

কর্মশালার উদ্বোধনী অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী অতিথি ও বক্তারা। ছবি: সায়দুর রহমান

বাংলাদেশে প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। এদেরকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। এক শ্রেণীর মানুষ তাদের বিশ্বাস, জাতিগত পরিচয়, পেশা, ভাষা, ইতিহাস এবং ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রান্তিক বা বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত হয় যার মধ্যে পড়ে চা জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, হরিজন বা সুইপার, ঋষি, কাওরা, বেদে, জলদাস, যৌনকর্মী এবং বিহারি।

আরেক শ্রেণীর বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে কুমার, সাধারণ জেলে, কামার, স্বর্ণকার, বাঁশ ও বেত পণ্যের কারিগর, রংমিস্ত্রী, মুচি, ময়রা, তেলি, নাপিত, ধোপা, উর্দুভাষী তাঁতি, দর্জি, হাজাম, মাঝি, বেহারা, কসাই ইত্যাদি। তবে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী যে শ্রেণীরই হোক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বিচ্ছিন্নতা বংশানুক্রমিক ও অন্তহীন।

প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সমস্যা ও সমাধানের নানা দিক নিয়ে ২২ আগস্ট ২০১৬ এলজিইডি মিলনায়তনে জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করে সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি), খ্রিস্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি) এবং গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইকো-কোঅপারেশন-এর অর্থায়নে পরিচালিত সাড়ে তিন বছরের প্রকল্প, “বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞায়ন, তাদের বর্তমান অবস্থার চিত্রায়ণ এবং তাদের সক্ষমতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি” এর অংশ এই কর্মশালা।

কর্মশালার মূল বার্তা বাংলাদেশের ৮০ লাখের মতো প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন মানুষকে উন্নয়নের দৌড়ে কোনভাবেই পেছনে ফেলে রাখা যাবে না।

কর্মশালায় উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, অর্থনীতিবিদ, উন্নয়নকর্মী, মানবাধিকারকর্মী এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা যোগ

এ প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে দি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইকো কোঅপারেশন। এ প্রকাশনায় যেসব দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে তা আবশ্যিকভাবে দি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইকো কোঅপারেশন-এর নয়।

দেন। দিনব্যাপী এই আয়োজনে তারা প্রান্তিকতা ও বিচ্ছিন্নতা বিষয়ে নানা তথ্য এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন এবং প্রান্তিকতার অন্তর্নিহিত কারণসমূহ এবং এই বিচ্ছিন্নতার সমাধানে তাদের সুপারিশ পেশ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী খোলামেলাভাবেই তার মতামত তুলে ধরেন। "অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনসমূহ বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহের জন্য বৈষম্যমূলক এবং এতে তাদের প্রয়োজনসমূহ সঠিক আঙ্গিকে বিবেচনা করা হয়নি। এ কারণেই তারা প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন থেকে যাচ্ছে," বলেন ড. রিজভী।

ড. রিজভীর বার্তা সুস্পষ্ট: বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে এবং সরকার একের পর এক বিষয় নিয়ে কাজ করে চলেছে। তিনি কর্মশালার আয়োজকদের একটি ফোরাম গঠনের পরামর্শ দেন যেখানে অবহেলিত মানুষের কথা শোনা হবে। "তারা কী বলতে চান তা আমাদের শুনতে হবে এবং তাদের কী ধরনের সহোযোগিতা দরকার তা জানতে হবে," বলেন তিনি। চা জনগোষ্ঠীর অসহায়ত্ব এবং ভূমি সমস্যার ব্যাপারে তিনি বলেন বিদ্যমান আইনের ধারায় একটি সহজ সংশোধনীর মাধ্যমেই এর সমাধান সম্ভব।

কর্মশালার সূচনা বক্তব্যে প্রকল্পের পরিচালক ফিলিপ গাইন বাংলাদেশের প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর চিত্র তুলে ধরেন। এদের বর্তমান অবস্থার চিত্রায়ণ কতটা কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ তাও ব্যাখ্যা করেন। তিনি সেডের গবেষণায় পাওয়া চা ও ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী এবং যৌনকর্মীদের তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "সেড-এর গবেষণায় পাওয়া তথ্য অনুযায়ী চা বাগানে ৮০টি জনগোষ্ঠী রয়েছে। এর মধ্যে চা বাগান ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে এবং সরকারি তালিকায় নেই এমন ৩৭টি জাতিগোষ্ঠীর খোঁজ পাওয়া গেছে। এই তথ্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানচিত্রায়ণের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক।"

কর্মশালার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্পের মুখ্য গবেষক ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। তিনি ফিলিপ গাইনের বক্তব্যকে আরো সম্প্রসারিত করে কর্মশালার মূলকথা ব্যাখ্যা করেন। "কাউকে পেছনে ফেলে নয় - এটি এসডিজি'র (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল) একটি অঙ্গীকার যা পৃথিবীর সবদেশ গ্রহণ করেছে," বলেন ড. রহমান। "বাংলাদেশ গত কয়েক দশকে সাধারণভাবে দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যকে সফলভাবে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। তবে এখনও দারিদ্র্য একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষকে প্রান্তিকতা ও বিচ্ছিন্নতার ফাঁদে আটকে রেখেছে; এই বিচ্ছিন্নতা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বা অবকাঠামোগত নয়, এটি একটি সামাজিক ধারণাও বটে।" তিনি বিচ্ছিন্ন মানুষগুলোকে একসাথে নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপনের পরামর্শ দেন এবং এই মানুষগুলোর বিভিন্ন বিষয় সঠিকভাবে তুলে ধরতে প্রকল্প শেষে একটি ন্যাশনাল রিসোর্স সেন্টার গড়ে তোলার পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

বিশিষ্ট লেখক এবং জলদাস গোষ্ঠীর প্রতিনিধি ড. হরিশংকর জলদাস তার বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং প্রান্তিকতা ও বিচ্ছিন্নতার শিকড় নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "সমাজের তথাকথিত অভিজাত শ্রেণী এই শ্রেণী বিভাজন তৈরি করে আমাদের বঞ্চিত করে রেখেছে।" বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহকে সংগঠিত হয়ে নিজেদের অধিকার রক্ষায় সোচ্চার হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ দুঃখ প্রকাশ করে বলেন এখনও মানুষ তার বর্ণ, নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় ও পেশাগত কারণে বঞ্চনার শিকার। তিনি বলেন বাংলাদেশে ব্যাপক হারে দারিদ্র্য দূরীকরণের একটি মূল কারণ হল দরিদ্র মানুষেরাও বিশ্বাস করে "দারিদ্র্য কারো নিয়তি নয়।"

"দারিদ্র্য দূরীকরণে বাংলাদেশের অগ্রগতি তুলে ধরতে গিয়ে প্রায় এক কোটি মানুষকে পরিসংখ্যানগতভাবে লুকিয়ে ফেলা সম্ভব। তবে তখন আর সেটাকে মানবিক উন্নয়ন বলা যাবে না," বলেন এই অর্থনীতিবিদ। "যদি আমরা আমাদেরকে উন্নয়নের মডেল হিসাবে তুলে ধরতে চাই তাহলে এই মানুষগুলোকে মানবিকভাবে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে। তাহলেই সেটাকে মানবাধিকার রক্ষার মাধ্যমে সভ্য ধারার উন্নয়ন বলা যাবে," বলেন ড. মাহমুদ।

"অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনসমূহ বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহের জন্য বৈষম্যমূলক এবং এতে তাদের প্রয়োজনসমূহ সঠিক আঙ্গিকে বিবেচনা করা হয়নি। এ কারণেই তারা প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন থেকে যাচ্ছে।"

— ড. গওহর রিজভী

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রামভজন কৈরি দেশের চা শ্রমিকদের নিদারুণ কষ্টের কথা তুলে ধরেন। "আমাদের সাপ্তাহিক মজুরি খুবই কম। এ দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের নূন্যতম চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না। বাগান মালিকরা আমাদের যথেষ্ট খাবার, শিক্ষা ও চিকিৎসা ছাড়াই একটি দরিদ্র জীবনযাপনে বাধ্য করছে। তাই সন্তানদের জন্য সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা আমাদের জন্য অবাস্তব," বলেন কৈরি। তিনি চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা মিলিয়ে সাপ্তাহিক আয়ের যে হিসাব দেন তা হলো ৮৯৫ টাকা। "পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবারের সাপ্তাহিক খরচ কমপক্ষে ২,১০০ টাকা। তাই আয়-ব্যয়ের এই অসামঞ্জস্য চা শ্রমিকদের ক্ষুধার্ত থাকতে বাধ্য করে," বলেন কৈরি।

তিনি আরো বলেন শ্রীলংকা থেকে কমদামে নিম্নমানের চা আমদানি করায় বাংলাদেশের চা শিল্প এবং চা শ্রমিকদের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর যুগ্ম পরিচালক ড. দীপঙ্কর রায় জানান বাংলাদেশ সরকার আদিবাসী ও বিচ্ছিন্ন মানুষদের চিহ্নিত করতে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। "সরকারের একার পক্ষে সবকিছু করা সম্ভব নয়। তাই এনজিও, সুশীল সমাজ ও অন্যান্যদেরও এই উদ্যোগে সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে।"

কর্মশালার বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন ড. হামিদা হোসেন, ভাইস চেয়ারপার্সন, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ (রিব); এম. আব্দুল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

এছাড়াও কর্মশালার দ্বিতীয় অধিবেশনে নিজেদের সমস্যা ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরে যৌনকর্মীদের বিভিন্ন সংগঠন, বেদে জনগোষ্ঠী, বিহারি, আদিবাসী, হরিজন, চা শ্রমিক, সুইপার ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা। *কাজী মনজিলা সুলতানা ও সামান্থা শাহ্‌রিন।* ❑

প্রকল্প

বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞায়ন, তাদের বর্তমান অবস্থার চিত্রায়ণ এবং তাদের সক্ষমতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি

ছবি: ফিলিপ গাইন

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি), খ্রিস্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি) এবং গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে) বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করে তাদের বর্তমান অবস্থার মানচিত্রায়ণ এবং তাদের সক্ষমতা ও যোগাযোগ শক্তিশালী করতে ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে সাড়ে তিন বছরের একটি উদ্যোগ শুরু করেছে। এতে আর্থিক সহযোগিতা করছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইকো কোঅপারেশন। এই উদ্যোগের চূড়ান্ত লক্ষ্য বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহের বিষয়সমূহকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে একটি ন্যাশনাল রিসোর্স সেন্টার গড়ে তোলা।

প্রকল্পের কার্যক্রম: অংশগ্রহণমূলক গবেষণা, জরিপ, বিশ্লেষণ এবং অনুসন্ধান; চূড়ান্ত উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী, মানবাধিকার কর্মী এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা; বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহকে সুরক্ষা দেয় এমন আন্তর্জাতিক সনদ ও জাতীয় আইনের বিশ্লেষণ; জনসাধারণের অধিকার ও ভূমি রক্ষাকারী আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে প্রচারণা; বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহের সাথে অংশীদারিত্বমূলকভাবে তাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে তুলে ধরতে কনভেনশন, সাংস্কৃতিক উৎসব ও সংলাপ আয়োজন; বই প্রকাশনা, তথ্যচিত্র নির্মাণ, আলোকচিত্র প্রদর্শনী, নিউজলেটার, পোস্টার, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরি ও অন্যান্য প্রডাকশন এবং প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী এবং তাদের নিয়ে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠান ও নেটওয়ার্ককে সহায়তা দেবার জন্য ন্যাশনাল রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ।

এই প্রকল্প একটি অংশগ্রহণমূলক উদ্যোগ। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংগঠন, অ্যাসোসিয়েট প্রতিষ্ঠানসমূহ, চূড়ান্ত উপকারভোগী, প্রকল্পের কর্মী, বুদ্ধিজীবী, অন্যান্য উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ও চূড়ান্ত উপকারভোগীদের সাথে একত্রে প্রকল্পের কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করবে।

গবেষণা, অনুসন্ধান, প্রকাশনা বিক্রি ও বিতরণ, দক্ষতা বিনিময় এবং বাংলাদেশের সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে সহায়তার প্রচেষ্টা–এ বিষয়গুলো একত্রে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহের মানচিত্রায়ণই নিশ্চিত করবে না তাদের দুরাবস্থা ও চাহিদার দিকে নজর দিতেও সহযোগিতা করবে। সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য হচ্ছে প্রকল্প শেষে বাংলাদেশের প্রান্তিকতা ও বিচ্ছিন্নতা বিষয়ে একটি ন্যাশনাল রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া।

প্রকল্পের চূড়ান্ত উপকারভোগী

সমতলের আদিবাসী: পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং চা বাগানের বাইরে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ১৬টি জেলা, উত্তর-মধ্যাঞ্চলের ৭টি জেলা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দুইটি জেলায় অন্তত ৫০টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের বসবাস। এর মধ্যে মাত্র ১৩টি জাতিসত্তা সরকারি তালিকাভুক্ত।

চা জনগোষ্ঠী: সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও চট্টগ্রামের চা বাগানগুলোতে অন্তত ৮০টি জনগোষ্ঠী বসবাস করে। এরমধ্যে মাত্র নয়টি জাতিসত্তার কথা সরকারি তালিকায় উল্লেখ আছে।

হরিজন এবং ঋষি: এরা 'দলিত' হিসাবেও পরিচিত এবং এদের অনুমিত জনসংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ। অনেকের মতে এদের সংখ্যা আরো বেশি। পেশাগত কারণে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের মধ্যে এদেরকে সব থেকে প্রান্তিক, বঞ্চিত, প্রতারিত এবং বিচ্ছিন্ন বলে মনে করা হয়। দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম এ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য চরম, দীর্ঘস্থায়ী এবং বংশানুক্রমিক।

কায়পুত্র (শূকর চরানো যাদের পেশা): এই সম্প্রদায় কাওরা নামেও পরিচিত। যাদের অধিকাংশ হিন্দু। এ জনগোষ্ঠী মূলত সাতক্ষীরা, যশোর ও খুলনা জেলায় বসবাস করে। সমাজে দলিত হিসাবে বিবেচিত হয় তারা। সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে 'নোংরা' বা 'হারাম' হিসাবে বিবেচিত প্রাণী শূকর পালনের সাথে জড়িত হওয়ার কারণে বেশিরভাগ মানুষের কাছেই তারা অস্পৃশ্য।

বেদে: বেদে নামে পরিচিত জনগোষ্ঠী মুসলিম হলেও মূল মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। এই জনগোষ্ঠীর মানুষ অত্যন্ত দরিদ্র।

জলদাস: হিন্দু ধর্মের অনুসারী জলদাসদের বসবাস চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের উপকূলীয় অঞ্চল এবং উপকূলবর্তী নদীর পাশে। জলদাস শব্দের অর্থ 'জলের দাস'। জলদাস সমাজের অন্যতম প্রান্তিক একটি জনগোষ্ঠী।

যৌনকর্মী: যৌনকর্ম বাংলাদেশে একটি অসম্মানজনক পেশা হিসাবে বিবেচিত এবং এর সাথে জড়িত নারীদের অবমাননাকর বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়। যৌনকর্মীদের ক্ষেত্রে যেসব শব্দের ব্যবহার করা হয় তার প্রতিটিরই অর্থ দাঁড়ায় 'পতিত নারী'।

বিহারি: বিহারিরা ৫১টি জেলার ৭১টি ক্যাম্পে বাস করেন যার মধ্যে ঢাকার জেনেভা ক্যাম্প সব থেকে বড়। বর্তমানে বাংলাদেশে এরা সংখ্যালঘু একটি মুসলিম সম্প্রদায় যারা ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় এখানে আসে।

অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী: তেলি, নাপিত, ধোপা, উর্দুভাষী তাঁতি, দর্জি, হাজাম, মাঝি বা খোট্টা, বেহারা (পাল্কি-বাহক) এবং কসাই। ❑

বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণা ও অনুসন্ধান পদ্ধতি নিয়ে কর্মশালা

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। ছবি: প্রসাদ সরকার

'বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞায়ন, তাদের বর্তমান অবস্থার চিত্রায়ণ এবং তাদের সক্ষমতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি' প্রকল্পের গবেষণা, জরিপ, অনুসন্ধান কার্যক্রমের পদ্ধতি নির্ণয় ও তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে ঢাকায় ২৮ ও ২৯ মে ২০১৬ আবাসিক কর্মশালা আয়োজনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্স সেন্টার (পিপিআরসি)।

বিভিন্ন প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর ২৬ জন প্রতিনিধি ছাড়াও গণমাধ্যম কর্মী, মানবাধিকারকর্মী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রকল্পের বিষয়বস্তু, গবেষণা ও অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও সূত্র এবং বাংলাদেশের বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞায়ন ও তাদের বর্তমান অবস্থার মানচিত্রায়ণের জন্য গবেষণা, জরিপ, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান পদ্ধতির উন্নয়ন বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দেয়াই এই কর্মশালার উদ্দেশ্য।

সূচনা বক্তব্যে প্রকল্প পরিচালক ফিলিপ গাইন প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি জানান প্রকল্পটি অন্তত ৪৬ লাখ মানুষের সমস্যা ও চাহিদা নিয়ে কাজ করছে যারা সমাজে প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন।

প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর উপর গবেষণার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ও প্রকল্পের মুখ্য গবেষকদের একজন ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, "এই মানুষগুলো পরিসংখ্যানগতভাবে অদৃশ্য। আমরা তাদের সনাক্ত করতে চাই, তাদের উপর পরিষ্কার মানচিত্র বানাতে চাই এবং দেশ ও সারা পৃথিবীর কাছে তাদের তুলে ধরতে চাই।"

"স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ৮০% মানুষই ছিল দরিদ্র। তবে এখন সে অবস্থার অনেকটা উন্নয়ন হয়েছে। এখন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহের বিভিন্ন বিষয় সামনে নিয়ে আসা এবং তারা যে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে আটকে আছে সেখান থেকে তাদের বের করে আনা," বলেন ড. হোসেন।

বিশিষ্ট লেখক এবং জলদাস সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হরিশঙ্কর জলদাস প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহ তাদের প্রাত্যহিক জীবনে যে বৈষম্যের শিকার হয় তার প্রতি নজর দেয়া অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করেন। একই সাথে তাদের প্রতি সম্মান রেখে গবেষকদের কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "প্রান্তিক মানুষেরা প্রতিদিন যেসব সমস্যায় পড়েন তার সমাধান করতে হলে অবশ্যই প্রান্তিকতা ও বিচ্ছিন্নতার শিকড় খুঁজে বের করতে হবে।"

পিপিআরসি'র সিনিয়র ফেলো লিয়াকত আলী চৌধুরি ও প্রকল্প সমন্বয়কারী গাজী মিজানুর রহমান গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং তথ্যসূত্র নিয়ে আলোচনা করেন।

এছাড়া প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে গবেষণার নানা বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেন যৌনকর্মীদের প্রতিনিধি হাজেরা বেগম এবং বেদে সর্দার সৌদ খান। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ হিসাবে তারা তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। ❑

চাহিদা নিরূপণ ও পরামর্শসভা

প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহের সমস্যা, প্রয়োজন ও চাহিদা নিরূপণের উদ্দেশ্যে দেশের তিনটি স্থানে তিনটি অংশগ্রহণমূলক চাহিদা নিরূপণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ কর্মশালাগুলোতে অংশগ্রহণকারীরা তাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন সমস্যা ও বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি সমাধানের সুপারিশ করেন।

২৩ জুন ২০১৬ চট্টগ্রাম ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এনআইটি) হল রুমে একটি চাহিদা নিরূপণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রাম অঞ্চলের তিনটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী জলদাস, বিহারি এবং হরিজনদের অংশগ্রহণে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা পরিচালনা করেন পিপিআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। এ তিন জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকের আলাদা আলাদা চাহিদা, সমস্যা এবং সমাধানের ধরন রয়েছে যা বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে উঠে আসে। তবে আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা, অস্পৃশ্যতার সমস্যা সবার জন্য সাধারণ সমস্যা।

উত্তরবঙ্গের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ৩১ জুলাই ২০১৬ দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলায় গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নওগাঁ, রংপুর এবং দিনাজপুর থেকে মাহলে, সাঁওতাল, ওঁরাও, কোরা, কোড়া, মুশোহর, রবিদাস, ক্ষত্রিয়, ঋষি এবং কায়পুত্র (শূকর পালক) জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। বিহারি ও হরিজনদের মতো এ অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীও নানা সমস্যায় আছেন। 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০'-এ বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মাত্র ২৭টি সরকারি তালিকাভুক্ত হয়েছে। কিন্তু এর বাইরেও অনেক জাতিগোষ্ঠী বাংলাদেশে বংশপরম্পরায় বাস করছে যারা বাঙালি নয় এবং রাষ্ট্রও তাদের স্বীকৃতি দেয় না। সমতলের এই আদিবাসীদের আত্মপরিচয়ের সাংবিধানিক স্বীকৃতি সমস্যার পাশাপাশি ভূমির অধিকার, মাতৃভাষায় শিক্ষার সমস্যা, সরকারি চাকরি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ক্ষেত্রে কোটা সমস্যা অন্যতম।

৮ আগস্ট ২০১৬ চা জনগোষ্ঠী এবং তাদের একমাত্র ট্রেড ইউনিয়নের সহায়তায় সেড এবং পিপিআরসি চা জনগোষ্ঠী ও দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আদিবাসীদের চাহিদা নিরূপণের জন্য একটি কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালাটি মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার মাধ্যমে তারা বেশ কিছু সমস্যা চিহ্নিত করেন যা তাদের জীবনের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এই সমস্যাগুলো মূলত শিক্ষা, মজুরি, বাসস্থান, স্যানিটেশন, কোটা, ভূমি অধিকার, শ্রম আইন ও শ্রম আদালত সংক্রান্ত। এর পাশাপাশি তারা তাদের সংস্কৃতি, ভাষা এবং বাঙালি নয় এমন বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর পরিচয়ের স্বীকৃতি ও পরিচর্যা দাবি করেন।

পরামর্শসভা: কমিউনিটি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য অংশীদারদের (বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি সংস্থা, গণমাধ্যম ইত্যাদি) সাথে শ্রীমঙ্গল, দিনাজপুর ও মধুপুর-এ তিনটি স্থানে তিনটি পরামর্শসভার আয়োজন করা হয়। এসব পরামর্শসভার মূল উদ্দেশ্য ছিল কীভাবে কর্মশালা, সম্মেলন, উৎসব, গবেষণা ও প্রকাশনার কাজ ফলপ্রসুভাবে সম্পন্ন করা যাবে তা নিয়ে আলোচনা। কর্মএলাকা এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট বিষয় ও সমস্যা নিয়েও মতামত বিনিময় হয় এসব পরামর্শসভায়। ❑

চাহিদা নিরূপণ কর্মশালা অংশগ্রহণকারীরা।

"বাংলাদেশে প্রান্তিকতার চ্যালেঞ্জ বিষয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্টিং" শীর্ষক আবাসিক কর্মশালা

"বাংলাদেশে প্রান্তিকতার চ্যালেঞ্জ নিয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্টিং" বিষয়ে ঢাকায় ২৮-৩০ নভেম্বর ২০১৬ আবাসিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) এ কর্মশালা আয়োজনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য সাংবাদিকদের বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীগুলোর অবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়া, বাংলাদেশে প্রান্তিকতার চ্যালেঞ্জ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জনগোষ্ঠীসমূহের সমস্যার নানা দিক নিয়ে গণমাধ্যমের মনোযোগ বৃদ্ধি করা।

সারাদেশ থেকে টিভি, সংবাদপত্র এবং অনলাইন সংবাদ পোর্টালের ২১ জন সাংবাদিকসহ প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা এই কর্মশালায় অংশ নেন।

কর্মশালার মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করেন এর সঞ্চালক এবং প্রকল্প পরিচালক ফিলিপ গাইন। তিনি বাংলাদেশের বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেন। সেড-এর সাম্প্রতিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের সামগ্রিক ফলাফল তুলে ধরে তিনি জানান, বাংলাদেশে মোট ১১০টি চা জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ রয়েছে।

প্রকল্পের মুখ্য গবেষকদের একজন ড. হোসেন জিল্লুর রহমান গবেষণা ও অনুসন্ধানের মূল উপকরণ নিয়ে আলোচনা করেন। তার মতে দারিদ্র্যকে বুঝতে হলে যে চলকগুলো সম্পর্কে জানতে হবে তা হলো: (ক) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে প্রাপ্ত সুযোগ যা বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে অনেক কম; (খ) নতুন সৃষ্ট সুবিধাসমূহ প্রাপ্তির সুযোগ যেখানে তারা বরাবারই পিছিয়ে এবং (গ) সামাজিক বৈষম্য (অনেক বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষকেই সমাজে নিচু চোখে দেখা হয়)। তিনি বিচ্ছিন্ন মানুষদের নিয়ে গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ চলক–পরিসংখ্যান, আত্ম-মূল্যায়ন, অর্থনীতি, বসবাসের বা বাসস্থানের অবস্থা, মানবসম্পদ, সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি, পরিবর্তন এবং সমস্যাবৃক্ষ–নিয়ে অলোচনা করেন।

দৃশ্যমানতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ড. জিল্লুর রহমান বলেন, "আমরা যদি তাদের পরিসংখ্যানে দৃশ্যমান করে তুলতে পারি এবং তাদের সামাজিক অবস্থান, সমস্যা ও চাহিদাগুলোকে তুলে ধরতে পারি তবে তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন অনেক সহজে আসবে।"

বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সম্পর্কে জানাতে মুন্সীগঞ্জ থেকে আসা বেদে নেতা সৌদ খান এবং সাভার বেদে পল্লীর সংগঠন 'পোড়াবাড়ি সমাজকল্যাণ সংঘ'-এর সম্পাদক রমজান আহমেদ এবং টাঙ্গাইলের কান্দাপাড়া যৌনপল্লী নিয়ে কাজ করা সংগঠন 'নারী মুক্তি সংঘ'-এর সভাপতি হাসি বেগম অংশগ্রহণকারীদের সাথে একটি প্যানেল আলোচনায় বসেন। তারা সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

"বেদেরা তাদের জীবিকার জন্য বছরজুড়ে সারাদেশে ঘুরে বেড়ায়। তারা সরকারি জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে বাস করে এবং বহিরাগত হওয়ার কারণে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বৈষম্যের শিকার হয়। আমরা এরকম জীবন চাই না। আমরা এই যাযাবর জীবন ছেড়ে সম্মানের জীবন চাই," বলেন সৌদ খান। রমজান আহমেদ জানান সাভারের বেদে গ্রামের অধিবাসীরাও শিক্ষা, চিকিৎসা, স্যানিটেশন ও অন্যান্য সামাজিক সেবা থেকে বঞ্চিত। সৌদ খান ও রমজান আহমেদ সাংবাদিকদের বেদেদের কাছে গিয়ে তাদের ভাসমান জীবন নিয়ে রিপোর্ট করার আহ্বান জানান।

টাঙ্গাইলের কান্দাপাড়া যৌনপল্লীর নেত্রী হিসেবে কথা বলেন হাসি বেগম। তিনি ২০১৩ সালে যৌনপল্লীর উচ্ছেদ এবং সেখানে আবারো যৌনকর্মীদের ফিরে আসার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। একই সঙ্গে তিনি যৌনকর্মীদের জীবনযাপনে দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে রিপোর্ট করতে সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন।

ফিলিপ গাইন গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের বাগদা ফার্মে সাঁওতালদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া ও সাঁওতাল হত্যার ঘটনা তুলে ধরেন। সাংবাদিকতায় ভাল মানের প্রতিবেদনের উদাহরণ তুলে ধরতে তিনি ঢাকার হরিজনদের উপর সেড-এর করা একটি প্রতিবেদনের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি।

ডেইলি স্টারের প্রধান প্রতিবেদক পিনাকী রায় সংখ্যালঘু ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন রিপোর্ট করছেন। তিনি বলেন "বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং তাদের প্রতি সাংবাদিকদের আরো মানবিক হতে হবে।"

সিনিয়র সাংবাদিক ও নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর স্ট্রিংগার জুলফিকার আলী মানিক বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে নিয়ে তার লেখালেখির অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, "যারা দুর্বল ও নিজেদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে যথেষ্ট শক্তিশালী নয় তাদের সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। আমাদের উচিত তাদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের উদ্বেগ ও প্রয়োজনের বিষয়গুলো বোঝা।"

ফিলিপ গাইন ও জুলফিকার আলী মানিক সংবাদপত্রের জন্য লেখার অত্যাবশকীয় বৈশিষ্ট্য ও কৌশল নিয়েও আলাপ করেন। রিপোর্টিং করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে যেসব প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয় আলোচনায় তা তুলে ধরেন অংশগ্রহণকারীরা। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদ বিতরণের মধ্য দিয়ে কর্মশালা সমাপ্ত হয়। *কাজী মনজিলা সুলতানা*। ❑

কায়পুত্র, জলদাস ও চা জনগোষ্ঠী নিয়ে গবেষণা

বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরছে চট্টগ্রামের জলদাস মৎস্যজীবীরা। ছবি: ফিলিপ গাইন

বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহের সংখ্যা, জনসংখ্যা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের অভাব সবাই অনুভব করেন। প্রকল্পের চূড়ান্ত উপকারভোগী সমতলের আদিবাসী, চা শ্রমিক এবং অন্যান্য বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহের সংজ্ঞায়ন ও তাদের পূর্ণাঙ্গ মানচিত্রায়ণ মানবাধিকারকর্মী, নীতি নির্ধারক, যারা সিদ্ধান্ত নেন ও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

সিসিডিবি, জিবিকে ও পাঁচটি সহযোগি সংগঠনের অংশগ্রহণ ও সহায়তায় সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউমান ডেভেলপমন্ট (সেড) ও পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্স সেন্টার-এর (পিপিআরসি) পূর্বের গবেষণার ভিত্তিতে নতুন করে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর উপর জরিপ ও তথ্য বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত গোষ্ঠীসমূহ: ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহ (৫০), চা জনগোষ্ঠী (৮০), দলিত (সুইপার এবং ঋষি), কাওরা বা কায়পুত্র (যারা শূকর চরান), জলদাস, বেদে, যৌনকর্মী, বিহারী এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী।

কায়পুত্র (কাওরা): যারা শূকর চরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন তারা কায়পুত্র বা কাওরা নামে পরিচিতি। কায়পুত্ররা সমাজে অচ্ছুত কারণ তারা শূকর চরান। শূকর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে একটি 'নোংরা' প্রাণী। বাংলাদেশে এদের অনুমিত সংখ্যা বারো হাজার। হিন্দু ধর্মের অনুসারী কায়পুত্রদের বাস মূলত দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যশোর, সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলায়। সেড পরিচালিত প্রকল্পের আওতায় এদের উপর জরিপ সম্পন্ন হয়েছে।

কায়পুত্র সমাজের অনেকের সহযোগিতায় প্রকল্পের ১০ জন কর্মী জরিপের জন্য প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করেন। কায়পুত্রদের ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা, পেশা, আয়ের তথ্য, শিক্ষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন, ভূ-সম্পদ, ভূমি ছাড়া অন্যান্য সম্পদ, সেবা গ্রহণের সুযোগ, আর্থিক অবস্থা, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য শক্তির উৎস, নিরাপত্তা বেষ্টনীর সুবিধা, তাদের শক্তি ও সামর্থ্য, স্থানীয় প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠানে তাদের প্রতিনিধিত্ব, তাদের জীবনে আসা পরিবর্তন, সমস্যা বৃক্ষ এবং তাদের প্রয়োজন, চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৪১টি গ্রামে বসবাসকারী কায়পুত্ররা এখনও সক্রিয়ভাবে তাদের প্রথাগত এ পেশার সাথে জড়িত। এই সবগুলো গ্রামেই জরিপ চালানো হয়েছে। ওই অঞ্চলের আরো ২৯টি গ্রাম আছে যেখানে বসবাসকারী কায়পুত্ররা পেশা পরিবর্তন করেছে এবং খোলা মাঠে শূকর পালন ছেড়ে দিয়েছে। সাতক্ষীরা জেলার এসব গ্রাম এখন জেলেগ্রাম। প্রতিবেশিরা কায়পুত্রদের ঘৃণার চোখে দেখে তাই নিজেদের পরিচয় গোপন করে তারা।

যে ৪৬টি কায়পুত্র গ্রামে জরিপ চালানো হয়েছে তারমধ্যে যশোর জেলার পাঁচটি উপজেলা ও একটি পৌরসভার অন্তর্ভূক্ত ১২টি ইউনিয়নের ১৯টি গ্রাম এবং সাতক্ষীরা জেলার পাঁচটি উপজেলার ১৭টি ইউনিয়নের ২১টি গ্রাম এবং খুলনা জেলার চারটি উপজেলার অন্তর্ভূক্ত ছয়টি ইউনিয়নের ছয়টি গ্রামে জরিপ চালানো হয়েছে। এই গ্রামগুলোর মধ্যে পাঁচটি গ্রাম শূকর পালন ছেড়ে জেলে গ্রামে পরিণত হয়েছে। আরো ২৪টি গ্রামের কায়পুত্ররা শূকর পালন ছেড়ে মাছ চাষ বা ব্যবসাকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়ার তালিকায় আছে।

দারিদ্রে আটকে থাকা কায়পুত্রদের ব্যবসা পরিচালনার জন্য বড় অঙ্কের অর্থ প্রয়োজন হলেও ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত তারা। এই গোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার খুব কম এবং সামাজিকভাবে তাদের নানা ধরনের হেনস্থার শিকার হতে হয়।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ হবে।

জলদাস (জলের দাস): জলদাসরা ঐতিহ্যগতভাবে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়। পেশাগতভাবে প্রান্তিক এ জনগোষ্ঠী সামাজিক অস্পৃশ্যতার শিকার। প্রধানত সমুদ্রে মাছ শিকার করলেও জলদাসদের অনেকে নদীতেও মাছ শিকার করেন। তাদের জীবন ও জীবিকা চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় অঞ্চলের জোয়ার-ভাটার উপর নির্ভর করে। জলদাসদের নিয়ে গবেষণা করেছে পিপিআরসি।

জলদাস সম্প্রদায়ের শিক্ষাবিদ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ড. হরিশঙ্কর জলদাসের দেয়া তথ্য অনুসারে, কক্সবাজারের টেকনাফ থেকে চট্টগ্রামের মিরসরাই পর্যন্ত উপকূল বরাবর অন্তত ৬০টি স্থানে জলদাস সম্প্রদায়ের আনুমানিক দেড় লাখ মানুষের বাস। সন্দীপ, কুতুবদিয়া এবং মহেশখালী দ্বীপেও জলদাসরা বাস করে। কর্ণফুলী, সাঙ্গু ও মাতামুহুরী এই তিনটি নদীর চারপাশে নদী-নির্ভর কিছু জলদাস পরিবারের বসবাস আছে। তবে এসব পরিবারের অনেকেই ওই এলাকায় তাদের জীবিকা অর্জনের সুযোগ হারিয়ে চট্টগ্রাম শহরে চলে গেছে। জলদাসরা হিন্দু ধর্মের অনুসারী এবং তাদেরকে সমাজের সবচেয়ে নিম্নবর্ণের মানুষ হিসেবে গণ্য করা হয়।

জলদাসদের ২০টি গুচ্ছে ভাগ করে গবেষণা করা হয়েছে। এরমধ্যে চট্টগ্রাম জেলায় ১৬টি এবং কক্সবাজার জেলায় চারটি। জনসংখ্যা, শিক্ষা, পেশা, আয়ের উৎস, বাসস্থান, পয়ঃনিষ্কাশন, সুপেয় পানি, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য শক্তির উৎস, ভূ-সম্পদ, ভূমি ছাড়া অন্যান্য সম্পদ, সেবা গ্রহণ, আর্থিক অবস্থা, নিরাপত্তা বেষ্টনীতে প্রবেশের সুযোগ, ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িক ক্ষমতা, স্থানীয় সরকার বা নাগরিক সংগঠনে অংশগ্রহণ, পরিবর্তন, সমস্যাবৃক্ষ ও চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ হয়েছে।

চা শ্রমিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন: এর আগের একটি প্রকল্পের আওতায় সেড চা শ্রমিকদের উপর কাজ করলেও বর্তমান প্রকল্পে কিছু কৌশলগত কাজ চলছে। এরমধ্যে একটি চা শ্রমিক এবং তাদের একমাত্র সংগঠন বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বিসিএসইউ)-এর চাহিদা, ঝুঁকি এবং সীমাবদ্ধতাগুলো মূল্যায়ন এবং বিশ্লেষণ করা। সেড এবং বাংলাদেশ চা জনগোষ্ঠী আদিবাসী ফ্রন্ট-এর সহযোগিতায় বিসিএসইউ ও পিপিআরসি চা শ্রমিক ও বিসিএসইউ-এর নেতাদের (কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং পঞ্চায়েতের সদস্য) নিয়ে একটি নমুনা জরিপ এবং ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন (এফজিডি) করেছে। চা শ্রমিকদের উপর গুচ্ছ জরিপের তথ্য সংগ্রহ করতে এফজিডি'র মাধ্যমে গুণগত ও সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহের বিষয় বেছে নেয়া হয়েছে। চা বাগানগুলো এ, বি এবং সি-শ্রেণীতে বিভক্ত। বাছাইকৃত আটটি বাগানের মধ্যে ছয়টি এ ক্যাটাগরি এবং বাকি দুটি বি ও সি ক্যাটাগরির অন্তর্ভূক্ত। এই আটটি চা বাগান মৌলভীবাজার, সিলেট, হবিগঞ্জ এবং চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত।

চা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে, চা শ্রমিকদের পরিবারের সকল সদস্য চা বাগানে কাজ করার সুযোগ পায় না। তাই জরিপের আওতাধীন গোষ্ঠীর মধ্যে চা শ্রমিক এবং চা শ্রমিক নয় এমন পরিবারও অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। কিন্তু চা শ্রমিক না হলেও তারা নিজেদের একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত মনে করে। ❑

(বাম) শ্রীমঙ্গলের চা শ্রমিক। (ডান) গোপালগঞ্জে শূকর চরাচ্ছে কায়পুত্র। ছবি: ফিলিপ গাইন

শূকরের পাল চরানোর কাজ ছাড়তে চান নিখিল মন্ডল

নিখিল মন্ডল। ছবি: প্রসাদ সরকার

শূকর পালের রাখাল নিখিল মন্ডল (৩৫) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার আলতাপোল গ্রামের বাসিন্দা। পেশাগতভাবে তিনি শূকরের পাল চরানোর সাথে যুক্ত। তিনি কায়পুত্র বা কাওরা জনগোষ্ঠীর একজন মানুষ যারা খোলা মাঠে ও বিলে শূকরের পাল চরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে।

নিখিল মন্ডল তিন বছর ধরে শূকর চরানোর সাথে যুক্ত। শূকরের পাল চরানো খুবই কঠিন কাজ। "এটা খুবই ক্লান্তিকর কাজও বটে। কোনো ছুটির দিন ছাড়াই আমরা প্রতিদিন অন্তত ১৬ ঘন্টা কাজ করি। শূকরগুলো খোলা মাঠে অন্তত ১৪ ঘন্টা খায়," বলেন নিখিল। দুই থেকে পাঁচ শত শূকরের এক একটি পাল সামলানো খুব কঠিন কাজ। নিখিল একটি রাখাল দলের সদস্য। "শূকরের মালিকরা আমাদের সাথে ভালো আচরণ করে না। কখনো পাল থেকে একটি শূকর হারিয়ে গেলে আমাদের যেভাবেই হোক সেটিকে খুঁজে বের করতে হয়। খুঁজে না পেলে মজুরি থেকে টাকা কেটে রাখে মালিকরা," জানান নিখিল মন্ডল।

নিখিলের মতো রাখালদের মাসিক বা বাৎসরিক চুক্তিতে কাজে নিয়োগ দেয়া হয়। তাদের মাসিক বেতন সাধারণত পাঁচ হাজার থেকে সাত হাজার টাকা। সেইসাথে খাওয়ার খরচ, প্রয়োজনীয় পোশাক ও কিছু প্রসাধনী দেয়া হয়। যারা এক বছর মেয়াদে কাজ করে তাদের বাৎসরিক চব্বিশ হাজার বা তার থেকে কিছু বেশি টাকা এবং সাত থেকে দশটি শূকর দেয়া হয়। নিখিল অভিযোগ করেন মালিকরা তাদের বিভিন্নভাবে প্রতারিত করে। "একটি পালে অনেক শূকর থাকে কিন্তু সেই তুলনায় রাখালের সংখ্যা থাকে কম। এ কারণে পাল সামলানো আরো কঠিন হয়ে পড়ে," বলেন নিখিল মন্ডল। "আমাদেরকে পালা করে রাত জেগে শূকর পাহারা দিতে হয়। কোনোভাবে একটা

শূকরও পালিয়ে গিয়ে কারো ফসলের ক্ষেত নষ্ট করে তাহলে আমাদের গালিগালাজ এমনকি মারধরও করা হয়। মাঝে মাঝে ফসল নষ্ট করার জরিমানা, আমাদেরই দিতে হয়।"

খোলা মাঠে শূকর চরানোর প্রথাগত এই পেশায় খুবই অসন্তুষ্ট নিখিল। "এই পেশায় কোনো সম্মান নেই। অনেক শিশুকেও বাধ্য হয়ে এই কাজে আসতে হয়। খোলা মাঠে শূকর চরানোর এই কাজ আমাদের বন্ধ করা উচিৎ," বলেন কেশবপুর স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করা নিখিল।

সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার ২৪টি গ্রামের কায়পুত্ররা তাদের পুরনো শূকর চরানো পেশা ছেড়ে মৎস্যজীবী হয়ে গেছেন। অসম্মানজনক হওয়ার কারণে তারা আর কখনোই তাদের বাপ-দাদার পেশায় ফিরে আসতে চান না।

দুই সন্তানের বাবা নিখিল এই পেশা ছেড়ে দিতে চান। এর পরিবর্তে তিনি রিক্সা মেরামতের গ্যারেজে কাজ করতে চান তিনি। সন্তানদের লেখা-পড়া শেখাতে চান নিখিল। তার সন্তানরা দক্ষ ও যোগ্য হয়ে সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত হবে এমন স্বপ্নও দেখেন। তাহলে প্রথাগত পেশায় এসে বঞ্চনা, অপমান ও ঘৃণার শিকার হতে হবে না তাদের।

ধীরে ধীরে শূকর চরানো পেশার পরিধি কমে আসছে। এর প্রধান কারণ হিসেবে নিখিল মনে করেন যে শূকর চরানো ও খাওয়ানোর জন্য যে পরিমাণ খোলা মাঠের দরকার তা কমে গেছে। একসময় নদী, বিল ও অন্যান্য জলাভূমিতে শূকরের জন্য প্রচুর খাবার পাওয়া যেত। তবে এখন অনেক জলাভূমি শুকিয়ে যাওয়ায় তা আর পাওয়া যায় না। এছাড়াও বাংলাদেশে শূকরের মাংসের চাহিদা খুবই কম এবং বিদেশে রপ্তানি করার সুযোগও কম। আর শূকর পালনের জন্য কোনো সরকারি সাহায্যও পাওয়া যায় না।

দেশের যেখানেই শূকরের পাল দেখা যাক না কেন তার রাখালরা অবশ্যই কায়পুত্র জনগোষ্ঠীর মানুষ। খোলা মাঠে শূকর চরানোর ব্যাপারে কায়পুত্ররা বিশেষভাবে দক্ষ। এখন যারা পাল মালিক আছেন তাদের বেশিরভাগই 'শূদ্র' (হিন্দু বর্ণ প্রথায় চতুর্থ বর্ণ) এবং কিছু খ্রিস্টান। তবে কাওরাদের বিবেচনা করা হয় হিন্দু বর্ণ প্রথার পঞ্চম বর্ণ 'দলিত' হিসাবে।

বিভিন্ন গ্রাম থেকে কায়পুত্র পরিবারের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। নিখিলের গ্রামে বর্তমানে মাত্র ১২ কায়পুত্র পরিবার বসবাস করে। ৩০ বছর আগেও এই গ্রামে একশো'র মতো কায়পুত্র পরিবার ছিল। যেসব পরিবারের চাষের জমি ও অন্যান্য সম্পদ রয়েছে তারা গ্রামে থেকে গেছে। আর ভূমিহীন পরিবার ও শূকর চরানোর বিকল্প কাজে যাওয়ার সুযোগ যেসব পরিবারের ছিল না তারা অনেকেই অন্যত্র গিয়ে বসবাস করছে। অনেকেই আবার নিকটবর্তী যশোর শহরে গিয়ে বাস করছে।

কায়পুত্র জনগোষ্ঠীর উপর খুবই কম গবেষণা হয়েছে। ফলে মানুষ তাদের সম্পর্কে জানে না বললেই চলে। এরা যেভাবে খোলা মাঠে শূকর চরায় তাতে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না। এমনকি ফসলের ক্ষেতে শূকরের পালকে সাদরে ডেকে আনেন ক্ষেত মালিকরা। কয়েকশো শূকর দুই থেকে তিন ঘন্টার মধ্যেই এক একর জমির অবাঞ্ছিত আগাছা ও শিকড় পরিষ্কার করে ফেলতে পারে। এজন্য মুসলমান ক্ষেত মালিকরাও তাদের ফসলি জমিতে কায়পুত্রদের স্বাগত জানান। একটি শূকরের পাল কোনো কৃষিজমি ট্রাক্টরের চেয়েও দ্রুত গতিতে চাষ করে ফেলতে পারে। তারা যে বর্জ্য ফেলে যায় তাও জমির সার হিসেবে কাজ করে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইকো-কোঅপারেশন-এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত একটি প্রকল্পের অধীনে কায়পুত্র গ্রামসমূহের উপর জরিপ হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৪১টি গ্রাম পাওয়া গেছে যেখানে কায়পুত্ররা তাদের আদি পেশা ধরে রেখেছে। এছাড়াও আরো পাঁচটি গ্রামে জরিপ করা হয়েছে যেখানে কায়পুত্ররা আদি পেশা ছেড়ে অন্য পেশা বেছে নিয়েছে। এই জরিপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এতে কায়পুত্রদের ভেতর থেকে কয়েকজন শিক্ষিত যুবক, পাল মালিক ও রাখালেরা সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন। তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে কায়পুত্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সমাজে বসবাস করতে এবং মাঠে শূকর চরাতে তারা প্রতিদিন যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন তা খুঁজে বের করা হয়েছে। অনুসন্ধান এবং প্রত্যক্ষ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের সীমাহীন দুর্ভোগ সমাধানের ব্যাপারেও কিছু ধারণা তৈরি হয়েছে। *ফিলিপ গাইনের সাথে গৌতম বসাক।* ❑

নোটিশ বোর্ড

প্রকল্পের দ্বিতীয় বর্ষের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি

গবেষণা, জরিপ ও বিশ্লেষণ: প্রকল্পের দ্বিতীয় বছরে হরিজন, ঋষি, বেদে, যৌনকর্মী ও বিহারি জনগোষ্ঠীকে নিয়ে গবেষণা ও জরিপ করা হচ্ছে। এছাড়াও টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার বনে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীসমূহের উপর খানা জরিপ চলছে।

মনোগ্রাফ প্রকাশ: হরিজন, ঋষি, কায়পুত্র, জলদাস, বেদে, যৌনকর্মী ও বিহারীদের উপর মনোগ্রাফ প্রকাশিত হবে।

তথ্যচিত্র নির্মাণ: মধুপুরে বসবাসকারী বননির্ভর আদিবাসী ও তাদের জীবন সংগ্রাম নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ চলছে।

অনুসন্ধান: প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার ও উদ্বেগ-এর নির্বাচিত ঘটনা নিয়ে অনুসন্ধান।

প্রশিক্ষণ কর্মশালা: প্রকল্পের চূড়ান্ত উপকারভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্বিতীয় বছরে বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। চূড়ান্ত উপকারভোগীসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা এতে অংশগ্রহণ করছেন।

কনভেনশন ও সাংস্কৃতিক উৎসব: ২০১৭ সালের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তরবঙ্গে একটি জাতীয় কনভেনশন ও সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন করা হচ্ছে। চূড়ান্ত উপকারভোগীসহ সকল উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মানুষেরা এতে অংশগ্রহণ করবেন। কনভেনশন ও উৎসবে প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের পরিচয়, জীবন, সংস্কৃতি, জীবনসংগ্রাম ও প্রতিকূলতার নানাদিক তুলে ধরা হবে। ❑

আদিবাসী শিল্প এবং আদিবাসী সাজ-পোশাকের সংরক্ষণ যে আদিবাসীদের জাদুঘরের নমুনা হিসাবে রাখার ইচ্ছাকে ইঙ্গিত করে আমি সেই সমালোচনার সাথে একমত নই। আশঙ্কার বিষয় হলো এই মানুষগুলো তাদের সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলবে এবং তা প্রতিস্থাপনের জন্য কিছুই বাকি থাকবে না।

—জওহরলাল নেহেরু

গ্রন্থ পর্যালোচনা

লোয়ার ডেপথস

লিটিল-নোন এথনিক কমিউনিটিস অব বাংলাদেশ

সম্পাদনা: ফিলিপ গাইন
২১২ পৃষ্ঠা, ২০১৬
প্রকাশক: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)

সর্বশেষ সরকারি হিসাব (২০১০) অনুযায়ী বাংলাদেশের আদিবাসী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংখ্যা ২৭ (পুনরাবৃত্তি বাদ দিলে এই সংখ্যা ২৪)। আদিবাসীদের নিজস্ব হিসাব অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ৪৫-এর বেশি। এদের মধ্যে ১১টি জাতিগোষ্ঠীর বসবাস চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)-এর সর্বশেষ গবেষণায় (২০১৪-২০১৫) চা বাগান ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে ৩৭টি জাতিসত্তার খোঁজ পাওয়া গেছে যারা সরকারি হিসাবে অদৃশ্য। এই জাতিগোষ্ঠীগুলো দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, উত্তর-মধ্যাঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ২৫টি জেলায় বসবাস করে।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬টি, উত্তর-মধ্যাঞ্চলের সাতটি এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দুইটি জেলার ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোকে নিয়ে সেড-এর একটি সাম্প্রতিক প্রকাশনা *লোয়ার ডেপথস: লিটিল-নোন এথনিক কমিউনিটিস অব বাংলাদেশ*।

বইটিতে সমতলের ৪০টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল ছাপা হয়েছে যেখানে তাদের উৎপত্তির ইতিহাস, জীবন, জীবিকা, শিক্ষাগত অবস্থা, সাংস্কৃতিক ও প্রথাগত রীতিনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। প্রতিটি প্রোফাইলের সাথে একটি করে প্রতিকৃতি, তাদের অবস্থানের বিবরণ দিয়ে একটি করে সারণী এবং একটি করে ভৌগলিক মানচিত্র (জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক) রয়েছে।

জাতিগোষ্ঠীগুলোর প্রোফাইল ছাড়াও এই বইটিতে উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের উপর হামলা, হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও অন্যান্য নির্মম ঘটনার উপর বেশকিছু অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। এই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনগুলো আগেই কোনো না কোনো জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকা বা ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছে। এসব

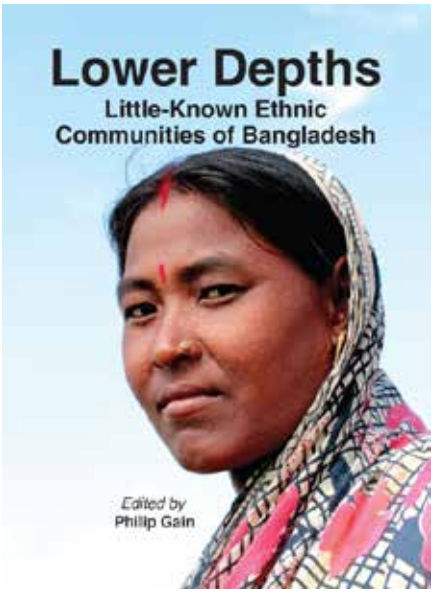

রিপোর্ট আদিবাসীদের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনার প্রকৃতি বুঝতে সহায়তা করবে।

বইটির একটি বিশেষ সংযোজন হল চা শ্রমিক ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর এজেন্ডা যা তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে তৈরি করা হয়েছে।

সেড প্রকাশিত চা জনগোষ্ঠীর উপর লেখা বই *(স্লেভস ইন দিজ টাইমস: টি কমিউনিটিজ অব বাংলাদেশ) ও ছবির অ্যালবাম (অন দি মার্জিনস: ইমেজেস অব টি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এথনিক কমিউনিটিজ)*-এ যেসব জাতিসত্তা নিয়ে লেখা বা ছবি ছাপা হয়েছে তাদের বিবেচনায় নিলে দেখা যাবে এদেশে বাঙালি বাদে অন্তত ১১০টি জাতিসত্তার হিসাব পাওয়া যায়। যার অর্থ দাঁড়ায় সরকার এখনো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জাতিগোষ্ঠীকে স্বীকৃতি দেয়নি। এই বইটিসহ আদিবাসীদের নিয়ে সেড প্রকাশিত অন্যান্য প্রকাশনা সরকার ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংগঠনগুলোকে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের পরিচয় সম্পর্কে একমত হতে সাহায্য করবে।

বইটির মূল বার্তা ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহ বাংলাদেশের সবচেয়ে বিপন্ন মানুষদের মধ্যে অন্যতম। এরা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন এবং এদের বেশিরভাগই নিরক্ষর, সুবিধা বঞ্চিত এবং প্রান্তিক। তারা নিজেদের ভাষার অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে। পাশাপাশি হারিয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি, ইতিহাস, শিক্ষা, জ্ঞান এবং ঐক্য। এসব কারণে শধুমাত্র জাতিগত পরিচয়ের স্বীকৃতিই নয় একইসাথে রাষ্ট্রের কাছ থেকে সমান সুযোগ এবং বিশেষ মনোযোগের দাবীদার তারা। ❑

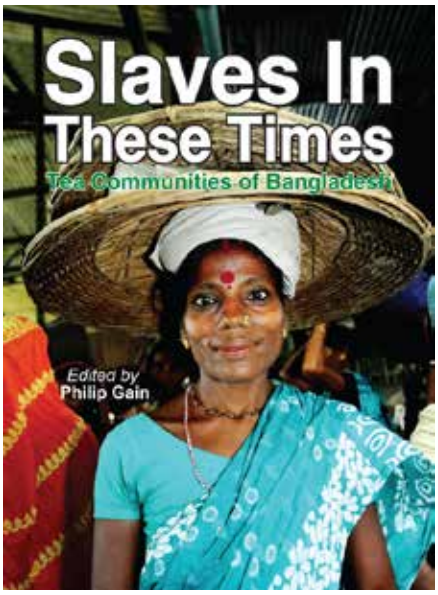

স্লেভস ইন দিজ টাইমস: টি কমিউনিটিস অব বাংলাদেশ

সম্পাদনা: ফিলিপ গাইন
৩৮৮ পৃষ্ঠা, ২০১৬
প্রকাশক: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)

স্লেভস ইন দিজ টাইমস: টি কমিউনিটিস অব বাংলাদেশ বাংলাদেশের চা জনগোষ্ঠীসমূহের জাতি ও গোষ্ঠী পরিচয় এবং চা শিল্পের সার্বিক অবস্থা নিয়ে গ্রন্থ। সেড-এর গবেষণা অনুসারে সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও চট্টগ্রামের ১৬০টি চা বাগানে ৮০টি (বাঙালিসহ) জাতিসত্তার খোঁজ পাওয়া গেছে। যার মধ্যে মাত্র নয়টির কথা উল্লেখ আছে ১৯৯১ সালের আদমশুমারি এবং ২০১০ সালের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইনে। এই জাতিগোষ্ঠীগুলো হলো ত্রিপুরা, সাঁওতাল, ওঁরাও, রাজবংশি, মারমা, মনিপুরি, মুন্ডা, মাহলে এবং গারো।

বইটিতে এই ৮০টি জাতিসত্তার সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল ছাপা হয়েছে যেখানে তাদের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় উঠে এসেছে। এর মাধ্যমে প্রতিটি চা বাগানে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যও উঠে এসেছে। প্রতিটি প্রোফাইলের সাথে একটি করে প্রতিকৃতি, চা জনগোষ্ঠীর অবস্থানের বিবরণ দিয়ে তৈরি সারণী এবং ভৌগলিক মানচিত্র রয়েছে। এর মাধ্যমে চা বাগানের সংখ্যা, চা জনগোষ্ঠীর মধ্যে কারা কোন উপজেলা এবং জেলায় বসবাস করেন

তার তথ্য রয়েছে। এই চা জনগোষ্ঠীর আদি নিবাস ছিল বিহার, মাদ্রাজ, ওড়িষ্যা, অন্ধ্র প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশসহ ভারতের বেশকিছু এলাকা। সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন চা বাগানে কাজ করার জন্য দেড়শো বছরেরও আগে বিভিন্ন ব্রিটিশ কোম্পানি তাদের নিয়ে আসে। বাংলাদেশের নাগরিক হয়েও চা শ্রমিকেরা অন্য নাগরিকদের মতো অধিকার পায় না। তাদের জীবন চা বাগান আর লেবার লাইনেই বন্দি।

চা জনগোষ্ঠীর প্রোফাইল ছাড়াও বইটিতে আছে চা শিল্পের উপর সাধারণ ধারণা, চা বাগানগুলোর সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল, চা জনগোষ্ঠীর বঞ্চনা ও বিচ্ছিন্নতার উপর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। চা শিল্প ও চা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, পরিভাষা, ওয়েব রিসোর্স, চা জনগোষ্ঠী ও চা শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত নথি এবং চা বাগানসমূহের ভৌগলিক মানচিত্রও (জেলা ও গোটা দেশ ভিত্তিক) স্থান পেয়েছে।

বইটির মূল বক্তব্য হচ্ছে চা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের সবচেয়ে বিপন্ন মানুষদের মধ্যে অন্যতম। এরা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন, নিম্ন মজুরির শ্রমিক, শিক্ষা এবং সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তারা নিজেদের ভাষার অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে। পাশাপাশি হারিয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি, ইতিহাস, শিক্ষা, জ্ঞান এবং ঐক্য। এসব কারণে জাতিগত পরিচয়ের স্বীকৃতিই নয় একই সাথে রাষ্ট্রের কাছ থেকে সমান সুযোগ এবং বিশেষ মনোযোগের দাবীদার তারা।

এই বইটির তথ্য ও সেড প্রকাশিত বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও চা জনগোষ্ঠীর উপর লেখা বই ও তাদের ছবি নিয়ে প্রকাশিত বই সম্মিলিতভাবে ওই এলাকায় বসবাসকারী জাতিসত্তা ও চা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা দেবে। ❑

বাগদা ফার্ম ট্র্যাজেডি ও উদ্বিগ্ন সাঁওতাল নারী। ছবি: ফিলিপ গাইন

বাগদা ফার্ম হত্যাকাণ্ড—রাষ্ট্র বনাম আদিবাসী

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন রংপুর চিনিকল তৈরি করতে ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৮৪২.৩০ একর জমি অধিগ্রহণ করে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার। প্রয়োজনীয় আখ চাষের জন্য ১৫টি আদিবাসী ও পাঁচটি বাঙালি গ্রামের সব বাসিন্দাদের তাদের বসতভিটা থেকে উঠিয়ে দেয়া হয়। লোকসানে থাকা রংপুর চিনিকল ২০০৪ সালে বন্ধ করে দেয়া হয় এবং চিনিকল কর্তৃপক্ষ স্থানীয় প্রভাবশালীদের কাছে 'বেআইনিভাবে' অধিগ্রহণকৃত জমি ইজারা দেয়। চিনিকল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে ওই জমিতে আখ চাষও সেভাবে হতো না। তাই জমির প্রকৃত মালিকদের (যাদের অধিকাংশই সাঁওতাল, কিছু অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তা এবং বাঙালি) দাবি, অধিগ্রহণকৃত জমিতে আখ চাষ না হলে প্রকৃত মালিকদেরকে জমি ফিরিয়ে দেয়া হোক। তাই পূর্বপুরুষের জমি ফিরে পেতে 'সাহেবগঞ্জ বাগদা ফার্ম ভূমি উদ্ধার সংগ্রাম কমিটি'র ব্যানারে ২০১৪ সাল থেকে আন্দোলন শুরু করে তারা।

ভূমি উদ্ধার কমিটি তাদের জমি ফেরত পেতে প্রশাসনের সাথে দেনদরবার করলেও তাতে কোনো লাভ হয় না। এক পর্যায়ে বাগদা ফার্মের ভেতরে গিয়ে বসবাস ও চাষাবাদ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয় কমিটি। ১ জুলাই ২০১৬ থেকে সাঁওতালসহ অপর জাতিগোষ্ঠীর মানুষজন আনুমানিক দুই হাজার অস্থায়ী ঘর তুলে বাগদা ফার্মের ভেতরে বসবাস শুরু করে। বসতি স্থাপন শুরু করার পর থেকেই রংপুর চিনিকল কর্তৃপক্ষ, প্রশাসন ও পুলিশের সহায়তায় তাদের উচ্ছেদের চেষ্টা শুরু করে। ৬ নভেম্বর ২০১৬ সকালে রংপুর চিনিকল কর্তৃপক্ষ পুলিশের পাহারায় বাগদা ফার্মে আখ কাটতে গেলে পুলিশ ও রংপুর চিনিকলের শ্রমিক-কর্মকর্তাদের সাথে সংঘর্ষ হয় তাদের। পুলিশের গুলিতে সাঁওতালদের দুই জন নিহত হন এবং কয়েকশ মানুষ আহত হন। নিজেদের রক্ষার জন্য সাঁওতালদের ছোড়া তীরে বিদ্ধ হন কয়েকজন পুলিশ সদস্য।

সেদিন সন্ধ্যা নাগাদ বিপুল সংখ্যক পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি সদস্য ও স্থানীয় বাঙালিরা বাগদা ফার্মে সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসীদের উপর হামলা চালায়। "অস্ত্রধারী বাহিনী নির্বিচারে গুলি করতে শুরু করে," বলেন বার্নাবাস টুডু। "বুঝতে পারি খালি হাতে এই বিশাল সশস্ত্র বাহিনীকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তখন সবাই পালাতে শুরু করি।"

সারা রাত তাণ্ডব চলে। বাগদা ফার্মের ভেতরে পাঁচটি অঞ্চলে নির্মিত সব ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আগুন লাগিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পাশাপাশি চলে লুটপাট।

৭ নভেম্বর সকাল পর্যন্ত সব বাড়ি-ঘর পোড়ানো শেষ হলে আলামত ধ্বংস করতে চিনিকল কর্তৃপক্ষ ভারি ট্রাক্টর এনে সমস্ত জমি চাষ করে ফেলে। মাত্র দুই দিনের মধ্যে ফার্ম এলাকার বসতবাড়ি আর সবজি ক্ষেতের সব চিহ্ন মুছে ফেলা হয়।

হামলায় ক্ষতিগ্রস্তরা আতঙ্কিত হয়ে বাগদা ফার্ম এলাকা ছেড়ে যান। ফার্মের পাশ্ববর্তী মাদারপুর ও জয়পুর গ্রামের সাঁওতাল ও অন্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর বাসিন্দারাও গৃহবন্দী হয়ে পড়েন। গ্রামবাসীর প্রবেশ ঠেকাতে ওই সময় বাগদা ফার্ম এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দিতে শুরু করে চিনিকল কর্তৃপক্ষ।

ক্ষতিগ্রস্তদের সমবেদনা জানাতে ১২ নভেম্বর সকালে মাদারপুর গ্রাম পরিদর্শন করেন গাইবান্ধা জেলার সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার ও বিচার বিভাগের প্রতিনিধিরা। জেলাপ্রশাসক জানান, ৬ নভেম্বরের হামলার ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সম্ভাব্য সব ধরণের সহায়তা দিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তবে সরকারি প্রশাসন বা পুলিশ কর্তৃপক্ষ কেউই সাঁওতালসহ অন্যদের উপর গুলি চালানোর দায় স্বীকার করেনি। পূর্বপুরুষের জমির উপর মালিকানা দাবির প্রসঙ্গে জেলা প্রশাসক সাঁওতালদের বলেন, "বাগদা ফার্ম এলাকার জমির আইনত মালিক রংপুর চিনিকল। আর মালিকানার বিষয়ে জটিলতা দেখা দিলে কেবল আদালতই তার সুরাহা করতে পারবে।"

বাগদা ফার্মে সংঘর্ষ, আগুন আর লুটপাটের ঘটনায় মোট সাতটি ফৌজদারি মামলা ও তিনটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়। সাঁওতাল, রংপুর চিনিকল কর্তৃপক্ষ, পুলিশ এবং কিছু মানবাধিকার সংগঠন এসব মামলা ও পিটিশন দায়ের করে। ঘটনার এক বছর পেরিয়ে গেছে। হত্যা ও অগ্নিসংযোগের মামলার অগ্রগতি বিশ্লেষণ করলে ফলাফল যা দাঁড়ায়: পাকিস্তান আমলে অধিগ্রহণকৃত জমি প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেবার দাবি যারা তুলছেন তাদের সার্বিক ক্ষতি এবং বাগদা ফার্মের জমির উপর রংপুর চিনিকল কর্তৃপক্ষ এবং রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা।
ফিলিপ গাইন ❑